নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২২, পৃ. ১৭-২৯
© ২০১৭ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

# বালক বিয়েঃ বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ বাস্তবতায় বাল্যবিয়ের উন্নয়নবাদী ডিসকোর্সের পুনর্পাঠ

মোসাব্বের হোসেন*
ফারজানা ইসলাম**

**Abstract:** Literature on Bangladesh child marriage is mostly associated with dominant development discourse that identifies the practice as a social malice, and focuses primarily on its causes and consequences. Attention also is given to its medical, educational, legal and human right dimensions. Within the discourse certain assumptions are taken as givens. Little has been published that attempt to analyze the discourse critically. This article is an attempt to critically engage with dominant narratives as regards child marriage especially by taking the perspectives of the child grooms and their social agency into account. By highlighting how legacy of colonial constructions still continue to shape developmentalist understanding about marriage and other social institutions in Bangladesh, and by drawing on work of critical theorists, here we take an effort to deconstruct the popular ways in which child marriage is viewed. By ethnographically examining social relations and considerations that inform early marriage decisions of boy grooms in particular, wehighlight the limitaions of 'right' based perspective that underpin most of the contemporary development thinking and practice. We contemplate here to show that a person may exercise his/ her agency in ways that are not uniform and contingent to social relations and cultural ethos.

## ভূমিকাঃ

*এটি ২০১৬ সালের ঘটনা। এ প্রবন্ধের সহ-লেখকদের একজন (হোসেন) ঢাকা থেকে তাঁর গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন। বাস থেকে নামার পর সিএনজিতে করে বিশ মিনিটে বাড়ি পৌঁছানো যায়। যে সিএনজি-তে তিনি উঠেছেন তার চালক বারবার পেছন ফিরে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। ছিপছিপে গড়ন, মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছেলেদের মতো পোশাক পরা, রোদে পোড়া চেহারার ছেলেটিকে হোসেন-এর চেনাই মনে হচ্ছিল। আনুমানিক বছর কুড়ি বয়স তার। বেশ কিছুক্ষন আলাপের পর তিনি চিনতে পারলেন রফিককে, ৮ বছর আগে তাঁর এক গবেষণায় ছেলেটি ছিল উত্তরদাতা। সিএনজি চলতে চলতে কথা এগুলো এবং আলাপের এক পর্যায়ে জানা গেল রফিক এখন দুই ছেলের বাবা। হোসেন-এর মনে পড়ে পূর্ববর্তী গবেষণায় উত্তরদাতা হিসেবে নিজের বিয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দর গুছিয়ে কথা বলেছিল ছেলেটি। রঙচঙে কাগজের ফুল দিয়ে ভ্যান সাজিয়ে নিয়ে সে বিয়ে করতে গিয়েছিল। মাইকে গান বেজেছে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন অনেক মজা করেছে। মেয়ের বাড়িতে ভাত, মাসকলাইয়ের ডাল ও গরুর মাংস দিয়ে মেহমানদের আপ্যায়ন করা হয়েছে। অবশ্য তার নিজের জন্য - মানে বরের জন্য - আলাদা করে পোলাও ও মুরগীর মাংসের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে অন্যদের যেমন আয়োজন করে বিয়ে হয় তারক্ষেত্রেও সেটি হয়েছে। বাবা-মা সম্বন্ধ করে তাকে বিয়ে দিয়েছিল। বয়স কম বলে সমাজের কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। 'বিয়ের দিন তাকে অনেক সুন্দর লাগছিলো'- স্মৃতি হাতড়ে প্রথম দেখায় নিজের স্ত্রীকে কেমন লেগেছিল সে অনুভূতি*

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
ইমেইলঃ mhossainju@gmail.com
** অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

*বলছিল তখনকার উত্তরদাতা, আজকের সিএনজি চালক। বিয়ের রাতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আড়ষ্ট ছিল, কোন কথা বলতে পারেনি পরস্পরের সাথে- আড়চোখে কেবল একবার মেয়েটিকে দেখেছিল সে। পরেরদিন থেকেই চিন্তা করতে হয়েছে কীভাবে সে তার পরিবারের দেখাশোনা করবে। বিয়ের সময় তার বয়স ছিলো মাত্র এগারো বছর- আর এখন সে দুই সন্তানের পিতা !*

প্রশ্ন আসতে পারে, বাল্যবিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবার পরও কোন সামাজিক পরিসরে এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটছে? বালক-বর কেন প্রশ্ন তুলছে না? কোন পরিস্থিতিতে সে বিয়ে করতে বা বিয়ে সম্পর্কিত পারিবারিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে? উত্তর সরল নয়, প্রেক্ষিত নির্ভর। সাধারণত সামাজিক ব্যক্তিক/প্রাইভেট পরিসরে অর্ন্তভুক্ত থাকে গৃহস্থালীর সদস্যবৃন্দ, তাদের থাকার জায়গা ও বস্তুগত সম্পদ। পারিবারিকভাবে সদস্যবৃন্দ এগুলির সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি চায়। তবে রফিকের পরিবারের মতো অনেক পরিবারেই কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক সম্পর্কগুলি (জ্ঞাতিবন্ধন) দুর্বল হতে দেখা যায়, রক্তসম্পর্কীয় ভাইদের মাঝেও সুপ্ত ও অকার্যকর সম্পর্ক দেখা যায়, পিতামাতা ও সন্তানদের মাঝের দায়বদ্ধতার সম্পর্ক ও প্রত্যাশা অনেক কম থাকে । ধরে নেয়া হয় বিয়ে সন্তানকে সাবলম্বী করে, তাই বাল্যবিয়ে পিতা-মাতা কে যেমন সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয় ঠিক তেমনি সন্তানকে দেয় নিজের মতো করে অনুপরিবার গড়ে তোলার সুযোগ, পিতামাতার দেখাশোনার দায়িত্বমুক্তি। পাবলিক পরিসর সম্পূর্ণ ভিন্ন, ব্যক্তি সচেতনভাবে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন সম্পর্কে জানার পরেও নিজে থেকেই সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় অংশগ্রহণ করে বা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তারা মনেই করে না এর বিরোধিতা করার সুযোগ অথবা দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। অবশ্যই বাস্তব পরিস্থিতি কখনোই এরকম সরল থাকে না, তবে সাধারন অর্থে, বাল্যবিয়ের প্রেক্ষাপট তৈরী করতে এটি এক ধরনের সামাজিক বাস্তবতার উদাহরণ হতে পারে।

রফিকের কেইস থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট- বাল্য বিয়ে মানে কেবল কম বয়সী মেয়ের বিয়ে নয়। বহু ক্ষেত্রেই রফিকের মত কম বয়সী ছেলেদের বর হবার ঘটনাও ঘটে। যদিও বালক বিয়ের বিষয়টি এখনও বিদ্যাজাগতিক চর্চাকারীগণ, গবেষক, লেখকদের আলোচনায় যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি। কিছু ব্যতিক্রম ব্যাতিত বালিকা বধূ আর বয়স্ক বরের যে ধ্রুপদী চিত্র কথা সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে কিংবা সামাজিক ইতিহাসে উঠে এসেছে তার প্রতাপে বালিকা বধূ এবং বালক বরের মধ্যকার বিয়ে ও তার সমাজ বাস্তবতা মনোযোগের কেন্দ্র থেকে হারিয়ে যায় । 'বালক বর ও বয়স্ক বধূর' সম্পর্ক (যেমন রহিম-রুপবান এর গল্প) নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় কাজ রয়েছে- তবে বিপরীতমুখী 'প্রচলিত সামাজিক মতাদর্শিক' অবস্থান, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ব্যক্তিক আইন ও স্বল্প সংখ্যার কারণে সামাজিক বাস্তবতার মাঝের ব্যক্তিক ও সামাজিক চর্চার পরিসরে এই ধরনের ঘটনাগুলি তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি ।

বাংলাদেশের পাশাপাশি উপমহাদেশে বাল্যবিয়েকে ঘিরে যেসব প্রকাশিত প্রকাশনা আছে তা থেকে বাল্যবিয়ের অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা স্পষ্ট (স্যুলার, ২০০৫)। পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের আইনেও (বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ১৯২৯) ছেলে-মেয়েদের নূন্যতম বিয়ের বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮, মূলত বাল্যবিয়ে বলতে ১৮ বছরের কম বয়সে মেয়েদের বিয়েকে বোঝানো হয়, কিন্তু এখানে ছেলেদের ২১ বছর বয়সের নিচের বিয়েকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বর্তমানে এই আইন সংশোধন করা হয়েছে, বিশেষ বিবেচনায় আঠারোর আগেও বিয়ে হতে পারে বলে একটি নীতি রাখা হয়েছে বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭ তে, যেখানে বিয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বয়স ও ব্যক্তিক সম্মতির তুলনায় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত বিশেষত পিতা-মাতার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এটাকি 'আধুনিকতা-বিরোধী' কোন অবস্থান? যথাযথভাবেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে একাডেমিক, নন-একাডেমিক পরিসরে। বাংলাদেশের সমাজ গবেষকেরা বিয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়স এবং সম্মতির বিষয়কে সবসময় গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সমালোচনামনস্করা বলছেন এই আইন আমাদেরকে

'আধুনিকতা পরিপন্থী' ও 'পশ্চাৎপদ' অবস্থানের দিকে নিয়ে যাবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার মুল ভিত্তি হলো সামাজিক ক্রিয়ায় ব্যক্তির সচেতন সম্মতি ও অংশগ্রহণ, যা বাল্যবিয়ে নিরোধ আইনে বিবেচিত হয়নি। বাল্যবিয়ে মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিয়ে, শারিরীক মানসিক নির্যাতন, রেপের মতো ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে ও বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক হেজিমনিক আধিপত্য বজায় রাখার প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করে, তাই বিয়েরক্ষেত্রে বয়স ও সম্মতিকে বিবেচনা করা জরুরী (সিদ্দিকী, ২০১০)। বালকবিয়ের প্রেক্ষিতে এই ধরনের ভাবনাকে পুনর্পাঠের চেষ্টা করা হয়েছে এই লেখায়।

বাল্যবিয়ে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা কঠিন হবে যদি না এটি সম্পর্কিত প্রচলিত পপুলার ডিসকোর্স ক্রিটিক্যালী পরীক্ষা না করা হয় এবং কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের পাশাপাশি কম বয়সী বালকেরাও কীভাবে এ চর্চার অংশ হচ্ছে তা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান না করা হয়। এই উপলব্ধিকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের একটি গ্রামে পরিচালিত সমাজ গবেষণায় প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এ রচনা। গবেষণাটি করা হয়েছিলো সিরাজগঞ্জের একটি গ্রামে, যেখানে দশজন বিবাহিত তরুণের নিবিড় সাক্ষাৎকার নেয়া হয় যাদের বয়সসীমা ছিলো এগারো থেকে আঠারো বছর[১]। এভাবে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে কিছু সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সহ-লেখকদের একজনের (ইসলাম) ঢাকা শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশায় নিয়োজিত নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের মধ্যে করা গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতাও কিছুক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই লেখাটির মুল উদ্দেশ্য দুটি: বাল্য বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত ডিসকোর্সকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ও এই ডিসকোর্সে কম গুরুত্ব পাওয়া বালক-বিয়ে চর্চার কিছু নজির তুলে ধরা। বাল্যবিয়ের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া তরুণদের যাপিত জীবন ও জীবনবোধকে এথনোগ্রাফিক বিবরণের মধ্য দিয়ে তুলে আনার চেষ্টাও এখানে থাকবে। কারা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলো, কে কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেছে এবং কেনো করেছে? কেনো বাল্যবিয়ে হচ্ছে তার তত্ত্বায়ন এবং সামাজিক বিষয় ব্যাখ্যার জন্য কোনো তত্ত্বীয় ধারণার উপস্থাপন করা এই লেখার উদ্দেশ্য না, এখানে কেবলমাত্র বাল্যবিয়েকে ঘিরে প্রচলিত জনপ্রিয় ডিসকোর্সের সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা চিহ্নিত করা এবং পাশাপাশি সমাজে তরুণদের যাপিত জীবন অভিজ্ঞতায় বাল্যবিয়ের বহুমাত্রিকতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি যেমন এই চর্চাকে ঘিরে মানুষের বহুবিধ জটিল অভিজ্ঞতাগুলিকে গুরুত্ব দিতে চায় তেমনি বাল্যবিয়ে কেন্দ্রীক প্রতিষ্ঠিত ডিসকোর্স এর পেছনের রাজনীতিকে বুঝতে চায়। প্রবন্ধটি ভূমিকাসহ চারটি অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় অংশে বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত উন্নয়ন ও বিদ্যায়তনিক ডিসকোর্স বির্নিমাণ ও এর পেছনের রাজনীতি সংক্রান্ত বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে এই ডিসকোর্সে কম গুরুত্ব পাওয়া বালক বিয়ে চর্চার নজির প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অংশে প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

## বাল্যবিয়ে ও এ সংক্রান্ত প্রচলিত ডিসকোর্সের সঙ্কীর্ণতা

বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত ডিসকোর্সে সাধারণত বাল্য বিয়েকে উন্নয়ন/মানবাধিকারের বিষয় হিসাবে দাঁড় করানো হয় যেখানে উপস্থাপন করা হয় এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় কেবলমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলির মেয়েরা। বাল্য বিয়ের চর্চা কেবলমাত্র বাংলাদেশ (বা উন্নয়নশীল দেশ) এ হয় না, এই চর্চার নজির স্থান, সংস্কৃতি ও ধর্মভেদে বৈচিত্রময়, তারপরও তথাকথিত বহুজাগতিক উন্নয়নসংস্থাগুলি ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত পন্ডিতেরা বাংলাদেশকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে (যেমন বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে অবস্থান) এদেশের 'পশ্চাৎপদতার' কারণ হিসাবে বাল্যবিয়েকে

[১] 'পুরুষের বাল্যবিয়ের প্রবাহমানতা: সিরাজগঞ্জের একটি গ্রামের অভিজ্ঞতায় অনুধাবন',২০০৭ সালের স্নাতক পর্যায়ে ৪০৮ নং কোর্সের আওতায় মো: মোসাব্বের হোসেনের গবেষণা অভিসন্দর্ভ, তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম।

গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে সামনে আনছে। যেখানে মূলত বাল্যবিয়েকে নির্ধারণ করা হচ্ছে সরলভাবে- কেবলমাত্র বিয়ের বয়স ও ব্যক্তিক সম্মতি কেন্দ্রীক চর্চার মধ্য দিয়ে। এই বোঝাবুঝির পাশাপাশি বাল্যবিয়ের চর্চাকে কেন্দ্র করে অন্য প্রেক্ষিতগুলিও অনুধাবন জরুরী যা একদিকে প্রপঞ্চটিকে বিস্তৃতভাবে বুঝতে সহায়তা করবে তেমনি সহায়তা করবে এই ধরনের প্রভিন্সিয়ালাইজিংয়ের[২] পিছনের রাজনৈতিক জট খুলতে। সমাজতত্ত্বে বাল্যবিয়েকে ঘিরে নানা ব্যাখ্যা রয়েছে - এক্ষেত্রে একদিকে প্রাধান্য পেয়েছে পশ্চিমা বিবাহ রীতি অন্যদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতি-প্রথা-পবিত্রতার বিষয়কে। বিশ্বের বিভিন্ন বিবাহ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুডি (১৯৯০) দেখেন প্রাচীন সমাজে বালিকা বধু বাছাইয়ের পেছনে কিছু কারণ আছে - সন্তানধারণকাল বেশি, অধিকতর বাধ্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য, নব্যগৃহস্থালীর আইনকানুন সহজে এবং দ্রুত গ্রহণ করে। ডিক্সন (১৯৭১) ভারত, আরব, চীন ও জাপানে বাল্যবিয়ের ঐতিহাসিক চর্চার প্রাধান্যকে তুলে ধরেছেন- এসকল সমাজে 'গোত্র ও বংশধারা' ব্যবস্থা রয়েছে যা নব্যবিবাহিতদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এর বিপরীতে 'পশ্চিমা বিবাহ ব্যবস্থায়' 'ব্যক্তিক দায়িত্ব' কে গুরুত্ব দেয়া হয় – আশা করা হয় বিয়ের পর নবযুগল তাদের ও তাদের সন্তানদের দায়িত্ব নিতে পারবে - স্বতন্ত্র গৃহস্থালী সামলানোর যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় সম্পদ ও পরিপক্কতা সেই জায়গায় প্রত্যাশিত- যার কারনে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে বিয়ে প্রচলিত পশ্চিমা সমাজে। এই কারণে পশ্চিমা ডিসকোর্সে সাধারণত, আঠারো বছরের আগের প্রাতিষ্ঠানিক বিয়ে বা অলিখিতভাবে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একসাথে থাকাকে বাল্যবিয়ে হিসাবে দেখা হয় (ইউনিসেফ, ২০১৪)। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনে বিয়ের বয়সের এই ন্যূনতম বৈধ সীমা নির্ধারিত হবার আরেকটি প্রভাবক হলো শিশু অধিকার সনদ, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ব্যাপারে কিছু বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৮৪ সালে পাশ হওয়া আইনে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের বৈধ বয়সসীমা ২১ ও ১৮ করা হয়, ২০০৪-০৫ এ এসে এটাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য নিবন্ধন বাধ্য করা হয় অন্যথায় ২ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান করা হয় তবে বর্তমানে বাংলাদেশে বয়স সংক্রান্ত আইন সংশোধিত হয়েছে। এই বদলের পিছনে যেমন কাজ করেছে স্থানীয় সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্মীয় চাপকে সামলানোর চেষ্টা, তেমনি কাজ করেছে বিবাহ আইন নিয়ে জাতীয় সিভিল ও প্রথাগত আইনের সংঘাত[৩] দূর করার চেষ্টা- যার কারণে কখনোই এই আইন ভালোভাবে প্রয়োগ করা যায়নি[৪]। বাংলাদেশের আইনী ব্যবস্থায় সিভিল আইন এবং ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনের সমান্তরাল উপস্থিতির কারণে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে তেমন করে জনসচেতনতাও তৈরী করা যায়নি, এই বৈপরীত্য দূর করার একটা প্রচেষ্টা বর্তমান আইন সংশোধনী। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এই ধরনের ভাবনা থেকে গত বছর Miscellaneous Provisions (Marriage) Bill, ২০১৬' তে বিয়ে সংক্রান্ত আইন সংশোধিত হয়েছে- ধর্ম ও স্থানীয় রীতি রেওয়াজকে মাথায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের কথা বলা আছে। কিছুক্ষেত্রে বয়সের বাধা আছে, বর্তমানে সেখানে ছেলে-মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স যথাক্রমে- হিন্দু বিয়ে আইনে ১৪ ও ১৮, মুসলিম আইনে ১২ ও ১৬, উড়িষ্যার ক্ষেত্রে ১৬ ও ১৮ এবং খ্রিস্টান ও সিভিল বিয়ে আইনে পারস্পরিক সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আইনের এই সংশোধনীর বিষয়টি বিতর্কিত, উন্নয়ন পরিমন্ডল হতে শুরু করে বিদ্যায়তনে অনেক পন্ডিতই এই বদলের প্রতি সমালোচনামনস্ক। শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদ (সি আর সি)

[২] প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন দিপেশ চক্রবর্তী। চক্রবর্তী (২০০০) দেখিয়েছেন প্রগতি, আধুনিকতা সম্পর্কিত উত্তর আলোকময়তার ইতিহাস সার্বজনীন নয় বরং প্রভিন্সিয়াল মূলতঃ আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস। আঠারো শতক হতে ইউরোপ পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হতে নিয়ন্ত্রাণাধীন উপনিবেশিত অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করতে শুরু করে, যেখানে গুরুত্ব পায় পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের অনুষঙ্গগুলি, যেখান থেকে এখনও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি বেরিয়ে আসতে পারেনি।

[৩] সিভিল আইনে বাল্যবিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ আর প্রথাগত ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইনে বৈধ।

[৪] United Nations Children's Fund (UNICEF, 2008), Early Marriage in South Asia: A Discussion Paper, 17 accessed from http://www.icrw.org/publications/too-young-wed-0

অনুযায়ী, শিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে হলে তাদের মানবাধিকার লজ্ঘিত হয়, বিশেষতঃ শিশু অধিকার। শিশু অধিকার সনদ দ্বারা প্রভাবিত এই বয়ানে ধরে নেয়া হচ্ছে আঠারো বছরের নিচে সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক, তারা তাদের জীবনের কোন বিষয়ে সম্মতি দেবার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে না, বিয়ের মতো সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তারা যথেষ্ট পরিপক্ক না। যদিও সম্মতির বিষয়টিও প্রেক্ষিতনির্ভর, বয়স নির্ভর না। সমাজে মানুষ যে ক্ষমতা সম্পর্কের মাঝে থাকে তার উপর নির্ভর করে কে কখন কোন অবস্থায় কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে বা কোন বয়ানের প্রতি সমর্থন জানাবে- সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে, এটি সম্পূর্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তিক এজেন্সী নির্ভর কোন বিষয় না (আনিতা ও গিল, ২০০৯) থেরেসা ব্লসে তাঁর কাজে (১৯৯৬) দেখিয়েছেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই নিজেকে একটা রাষ্ট্রের নাগরিকের বদলে সমাজের সদস্য মনে করে। এ কারণে সমাজে যে মতাদর্শ, রীতিনীতি প্রচলিত, ব্যক্তি সে অনুযায়ী আচরণ করে এবং জীবনযাপন করে। যার কারণে রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে ধারণা থাকলেও চর্চার ক্ষেত্রে তারা তাদের পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয় - সমাজে বাল্যবিয়ে চর্চা এটির একটি ভালো উদাহরণ।

বাল্যবিয়ে ডিসকোর্সে বাদ পড়ে যাওয়া আরেকটি বিষয় হলো তরুণদের যৌনতা। যৌনতার বৈধতার বিষয়টিও স্থান-কাল ও রীতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন (মিলার ও ভান্স, ২০০৪:৭)। পশ্চিমে ছেলে-মেয়েদের যৌন স্বাধীনতা আছে- সেক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়, এটা বিয়ে বা বয়স নির্ধারিত বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের সমাজবাস্তবতায় বিবাহবর্হিভূত যৌনসম্পর্ক অবৈধ, বিয়ে এর জন্য একটা বৈধ উপায় হতে পারে। আঠারোর আগে বিয়ে নিয়ন্ত্রণ তাদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে বিয়ের উদ্দেশ্য ও অর্থময়তা ভিন্ন ভিন্ন- অনেকক্ষেত্রেই এটা কেবলমাত্র পারিবারিক বিষয় নয় এর সাথে সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় যুক্ত থাকে। ব্যক্তিক স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব দিলে এই বিষয়গুলি আড়ালে চলে যায়। বাল্যবিয়ে ডিসকোর্সে পশ্চিমা শৈশবের ধারণাকে সার্বজনীনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, বালিকাবধূর এজেন্সীর বিষয়টি বাদ পড়ে যাচ্ছে, উপস্থাপন করা হচ্ছে তাদেরকে অবলা শিকার হিসাবে। এটাকে সাধারণত উন্নয়নের একটা ইস্যু হিসাবে দেখা হচ্ছে, সাংস্কৃতিক অপেক্ষতা, যৌনতা, শরীর কেন্দ্রীক রাজনীতি ইত্যাকার নানামুখী বিষয় কম গুরুত্ব পায়। এই ধরনের সরলকৃত উপস্থাপন অবশ্যই বাল্যবিয়ের বাস্তব অবস্থাকে পরিস্কার করে তুলে ধরে না, শুধুমাত্র মূল বাস্তবতার একটি খন্ডিত চিত্র উপস্থাপন করে, এই ধরনের ভাবনার যৌক্তিকতাকে প্রশ্ন করা তাই জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাল্যবিয়ে ডিসকোর্সে প্রচারিত হওয়া বয়ানগুলির অধিকাংশই সন্দেহাতীত ভাবেই পশ্চিমা, বাংলাদেশে সেগুলি প্রচলিত হওয়ার পেছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত আছে।

উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা এক্ষেত্রে উপনিবেশ সময় কালের ব্যক্তিক আইনগুলির কথা বলেন। উপনিবেশিত ভারতে মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তার জন্য দুটি জনপ্রিয় আইন ছিলো Age of Consent Act, ১৮৯১ এবং Sarda Act, ১৯২৯। আইনদু'টি পরস্পর বিরোধী, প্রথমটিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সকল বয়সী মেয়েদের সম্মতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আর দ্বিতীয়টিতে বিয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা ছেলে ও মেয়েদের যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ বলা আছে, কোন আইনই বিবাহ বর্হির্ভূত যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দেয় না- সুতরাং বাস্তব পরিস্থিতিতে এই আইনদু'টিকে পৃথক করা সমস্যাজনক হয়ে যায়, ব্রিটেনে এই দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দেবার জন্যই জনমত ছিলো- এবং সুবিধামতো আইন ব্যবহার করার সুযোগ ছিলো- যা একভাবে শাসনে সহায়তা করতো, যার কারনে বিতর্ক থাকাসত্বেও আইনদু'টির প্রচলন এখানে ছিলো (কোসাম্বি, ১৯৯১)। বাংলাদেশের আইনেও পূর্বে বৈপরীত্যময় আইনের সহউপস্থিতি

লক্ষ্য করা গেছে- যাকে একভাবে ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতার[৫] প্রভাব বলা যায়- যেখান থেকে বেরুনোর চেষ্টা করা হচ্ছে সাম্প্রতিককালে।

সিভিল আইনটি হয়েছে মুলত মানবাধিকার কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে[৬]- যা বিতর্কিত। এর একটি উদাহরণ ইউনিসেফের কাজ, এখানে তথাকথিত খারাপ ফলাফলগুলিকে উপস্থাপন করে নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি জোর দেয়া হয়। এই দলিল অনুসারে (ইউনিসেফ ২০১৪) আমাদের সমাজে বাল্যবিয়ে হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি চর্চা। মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ-ও বাল্যবিয়ে নারীর জন্য অধিক ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বিয়ের বয়স, বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি, বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা, মানুষের ব্যক্তিগত ও সম্পদ অধিকার প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। এই ডিসকোর্সে বাল্যবিয়ে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ ঝুঁকি সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত ও পুনরুৎপাদিত হচ্ছে: মেয়েরা জীবনভর নানারকম জটিলতার মধ্য দিয়ে যায়, স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ে, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ, বাচ্চা জন্মদান ও নানাবিধ শারিরীক-মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যায়। এর কারণ হিসাবে সামনে আনা হচ্ছে দরিদ্রতা, সামাজিক-পারিবারিক রীতি-রেওয়াজ, লিঙ্গীয় নীতি/মূল্যবোধ, নিরাপত্তা, দুর্বল আইন প্রয়োগ ইত্যাকার বিষয়গুলিকে, এগুলিকে প্রায় সবক্ষেত্রেই একইভাবে সমরূপী উপস্থাপন করা হচ্ছে, ধরেই নেয়া হয় বালিকারাই কেবল এই প্রথার চিরস্থায়ী শিকার, ছেলেদের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকছে, (কেননা তারা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম) উপেক্ষিত থাকছে এর পিছনের রাজনীতি- এই রাজনীতি অনুধাবনে উত্তর-উপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের গুরুত্বপূর্ন অবদান আছে।

উত্তর-উপনিবেশিক প্রেক্ষিত হতে বলা হচ্ছে বাল্য বিয়ে সংক্রান্ত প্রচলিত ডিসকোর্স রাজনীতি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষা দ্বারা প্রভাবিত- যা অনেকক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতাকে মাথায় রেখে সবকিছুকে দেখার চেষ্টা করে (ইমোহোজা, ২০১৪) গায়েত্রী স্পিভাকের (১৯৯৩: ৯৩) ভাষায় ব্রিটিশ কলোনিয়াল ডিসকোর্সে পশ্চিমারা নির্দিষ্ট করে সাদা চামড়ার মানুষেরা উপমহাদেশের বাদামী মেয়েদের বাদামী ছেলেদের কবল থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছে সেই সময়। সাম্প্রতিক মুসলিম মেয়েদের রক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা এই ডিসকোর্সের পুনরুৎপাদণ দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমা বিশ্ব এখন মুসলিম নারীদেরকে মুসলিম পুরুষের হাত থেকে বাঁচাতে চাচ্ছে, তাদের পর্দার বাঁধা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পালন করছে- যা মুলত বাস্তব অবস্থা নয়। লায়লা আবু লুঘদ (২০০২) তার কাজে এই ধরনের অধিকার কেন্দ্রিক আলোচনার সমালোচনা করেন। তিনি আরব নারীর বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন- তাদের স্বাধীনতা প্রশ্নে পশ্চিমা রাজনীতি উন্মোচন করেন। এই চিন্তাকে এডওয়ার্ড সাইদের প্রাচ্যবাদ সম্পর্কিত ভাবনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় (সাঈদ, ১৯৭৮)। বাল্য বিয়েকে ঘিরে এই আধিপত্যশীল বয়ানগুলি একদম শুরু হতেই আছে, যা কেবলমাত্র পুনরাবৃত্ত ও পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। এই ধরনের নির্মাণ একভাবে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে- এখানে এই প্রথার নেতিবাচক দিকগুলি উপস্থাপিত হচ্ছে, দরিদ্রতা থেকেও নারী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইনী প্রক্রিয়া জোরদারের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এই বয়ানগুলি বিনির্মাণ করা জরুরী, এর পেছনের রাজনীতিকে উন্মোচন করার পাশাপাশি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তু ও বিশ্বকে দেখতে হবে। 'উত্তর-উন্নয়ন' দৃষ্টিকোণ থেকেও সাম্প্রতিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে ক্রিটিক্যালী পর্যবেক্ষণের তাগিদ দেখা যাচ্ছে। 'উন্নয়নের' সমালোচনা করতে যেয়ে এসকোবার এই ধরনের বিষয়গুলিকে 'আধুনিকায়িত পিতৃতন্ত্র' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যা এখনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রন মূলক কৌশল বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে (এসকোবার, ১৯৯৫: ১৭৭) এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাকে এখনও 'অনুন্নত' হিসাবে উপস্থাপনের জন্য এই

---

[৫] ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা বলতে বোঝানো হয়েছে ব্রিটিশ উপনিবেশের সেই সকল রীতি, আইন ও চর্চাকে যার দ্বারা বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, আইনগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রভাবিত।

[৬] 'মানবাধিকারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' বলতে এই লেখায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ইউএন হতে গৃহীত 'Universal Declaration of Human Rights (UDHR)' এর মুলনীতি ও প্রক্রিয়াকে, এই দলিল বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য ও ব্যবহৃত (স্টেলনার ১৯৯৬)।

ধরনের ডিসকার্সিভ চর্চা দেখা যায়- দেখানো হচ্ছে তৃতীয়বিশ্বের মানুষেরা এখনও অসভ্য, পশ্চাদপদ, তারা নারী অধিকারকে সম্মান করে না- তারা এখনো আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি[৭], এই ধরনের ডিসকোর্স সাধারণত স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশকে বদলে দেয়। বাল্যবিয়ের মতো সামগ্রিক উন্নয়ন এজেন্ডাকে ঘিরে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে এরকম অনেক বিকল্প ভাবনা রয়েছে- যা মুলধারার উন্নয়ন আলোচনায় অবহেলিত। এ কথা অনস্বীকার্য, এই সকল বিষয় বাদ দিয়ে বাল্য বিয়ে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, এই প্রথাটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে প্রেক্ষিত, সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে। এখানে মেয়েদের পাশাপাশি বালক বিয়ে চর্চার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করা যেমন জরুরী তেমনি গুরুত্ব দিতে হবে এই ধরনের উপস্থাপনের পিছনের রাজনীতির দিকে।

বালক বিয়ে নিয়ে আমাদের কাজটিতেও আমাদের সমাজের মাঝে এই চর্চার উপস্থিতি ও বহুমাত্রিকতা ধরা পড়েছে। গবেষিতদের যাপিত জীবন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কেউ পারিবারিক প্রয়োজনে, সামাজিক চাপ এ পড়ে বিয়ে করেছে- এক্ষেত্রে কেউ বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতকে প্রাধান্য দিয়েছে আবার বিপরীতে কেউ কেউ নিজের পছন্দে বিয়ে করে। তবে, অভিভাবকের মতেই হোক আর অমতেই হোক, বালক বিয়ে চর্চার পেছনে প্রেক্ষিতনির্ভর কিছু বিষয়ের প্রভাব কাজ করেছে- বাল্যবিয়ের বিষয়টি কোনভাবেই সমরূপী নয়।

**বালক বিয়ে সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:**

গবেষণায় দেখা গেছে, বালক বিয়ের ক্ষেত্রে স্থানিক অর্থসামাজিক প্রেক্ষিত গুরুত্ব পেয়েছে, যা প্রত্যেক কেসের ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র, কোনভাবেই সমরূপী উপস্থাপন সম্ভব না। অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছা থেকে বিয়ে করে না, তার প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক আকাঙ্খা পূরণের জন্য তাকে বিয়ে করতে হয়, যেখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করে মুলত তার পরিবারের সদস্যরাই। সাধারণত বাংলাদেশে আয়োজিত প্রথাসিদ্ধ বিয়ের চর্চার ক্ষেত্রে, পিতা-মাতা বা মুরুব্বীরাই কখন ছেলে-মেয়ে বিয়ের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে তা নির্ধারণ করে বিভিন্ন প্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে যেখানে সর্বদা বিয়ের ন্যূনতম ১৮ বছর বয়সসীমা গুরুত্ব পায় না, বিয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক সিদ্ধান্তের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হলেও ব্যক্তিক পর্যায়ে দেখা যায় এই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব আছে- সামাজিক বা পারিবারিক চাপ, বস্তুগত কারণ, পারিবারিক সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া, টিকে থাকার কৌশল, সামাজিকভাবে কাম্য ভূমিকা, ভালোবাসা- পারিবারিক সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হবার ক্ষেত্রে এই ধরনের অগণিত কারণ রয়েছে। গবেষণায় তথ্যদাতা সাইফুলের জীবন অভিজ্ঞতায় এই ধরনের কিছু বিষয়ের প্রভাব দেখা গেছে-

> *"দুই বছর আগে সাবিনার সাথে সাইফুলের বিয়ে হয়। সাইফুলের তুলনায় বয়সে সাবিনা একটু বড়। বিয়ের সময় সাইফুলের বয়স ছিল ১৩ বছর আর তার স্ত্রী সাবিনার বয়স ছিল ১৪ বছর। পরিবারে সুবিধার জন্য অভিভাবকের কথায় সে তার বড় বোনের ননদকে বিয়ে করেছে। মায়ের অসুস্থতার কারণে পরিবারে সব কাজ সাধারণত তার বড় বোন সুফিয়া করত। কিন্তু সুফিয়া হঠাৎ ভালবেসে নিজের সিদ্ধান্তে প্রতিবেশী মিজানকে বিয়ে করে ফেলে। বিয়ের সময় সুফিয়ার বয়স ছিল ১৫ বছর। সুফিয়ার বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে পরিবারে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ গৃহস্থালীর কাজ করার উপযোগী আর কেউ তাদের বাসায় রইলো না। তাই তার বাবা-মা সাইফুলকে বিয়ে দেয়। সুফিয়া তার ননদের নাম প্রস্তাব করেন। সুফিয়ার স্বামী মিজানেরও এই বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। সাইফুলের পিতামাতা মিজানদের বাড়িতে বিয়ের ব্যাপারে*

---

[৭] মাকাও মাতুয়া (২০০১) উন্নয়ন- অধিকার ও এটি সংশ্লিষ্ট রেটরিক ও ডিসকোর্সের সম্পর্ককে রূপকার্থে উপস্থাপন করেছেন SVS ('Savages-Victim-Savior') হিসাবে- যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমাদেশ, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং একাডেমিশিয়ানরা মিলে এই ত্রিমুখী পিরামিড নির্মাণ করছে- যা একমুখী ও অনুমেয়- অনেকটা 'সাদা-কালো' নির্মাণের মতো- খারাপের বিপরীতে ভালোর অবস্থান নিতে হবে এইরকম।

> *প্রস্তাব দেয়। মিজানের ১৪ বছর বয়সী একটা বোন রয়েছে। মিজানের বাবা-মা আশা করেছিলেন মিজানকে বিয়ে দিয়ে যৌতুক হিসেবে কিছু অর্থ নেবেন। সেই অর্থ দিয়ে সাবিনাকে বিয়ে দেবেন। কিন্তু মিজানের আকস্মিক বিয়ের জন্য তাদের পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায়, সাবিনাকে বিয়ে দেয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরী হয়। এ পরিস্থিতিতে মিজানের পরিবার আগ্রহের সাথে তাদের মেয়েকে সাইফুলের হাতে তুলে দেয়। সাইফুলও পরিবারের সুবিধার কথা চিন্তা করে বিয়ে করে ।"*

সাইফুলের বিয়ের ক্ষেত্রে পিতামাতার অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ভূমিকা রেখেছে, বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে দেবার পিছনে নানাবিধ জটিল কারণ এগুলির মাঝে এটি অন্যতম - যা থেকে মুক্তির জন্য দরিদ্র পরিবারগুলি সন্তানদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় (স্যুলার ও রোটাচ, ২০১১)। সমাজ-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এই রকম পরিস্থিতিতে সন্তানের বৈধ বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই, যার কারণে পরিবার ভাবে তাদের হাতে আর কোন বিকল্প পথ নাই। তাছাড়াও মেয়েদের বিয়ের বিষয়ে সমাজে এক ধরনের উৎকণ্ঠা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে পরিবার সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের ব্যাপারে অনেক সচেতন থাকে। সাইফুলের কেসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গৃহস্থালীর কর্মী সংকট। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মনে করা হয় গৃহস্থালীতে কাজ করতে পারবে খালি মেয়েরা, এ জায়গায় শুধু তাকেই মানায়। যেহেতু সাইফুলের মা গৃহকর্ম নিয়মিত করতে পারে না, তাই তাদের গৃহস্থালীকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেখানে একজন নারী শ্রমিক আবশ্যক ছিল। তারা দরিদ্র বিধায় এ সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কোনো গৃহকর্মী নিয়োগ দিতে পারেনি। এই কেসে দেখা যাচ্ছে গৃহস্থালীর শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে জেন্ডার একটা বড় ভূমিকা পালন করে এবং এই শ্রমবিভাজন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেও পরিবারই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যেহেতু সাইফুল ছিল তাদের পরিবারের বড় সন্তান, তাই তার অভিভাবকরা পরিবারের স্থবির হয়ে পড়া চিরায়ত শ্রম-বিভাজন গতিশীল করার জন্য সাইফুলকে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ আনা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা খুঁজে পাননি। বিষয়টা এতোই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, প্রথা অনুযায়ী মেয়ের বয়সের দিকেও তারা নজর দেননি। এক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের বিষয়টিও কাজ করেছে। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে, উভয় পরিবার এর পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার কৌশল হিসেবেই সাইফুলকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। সাইফুলও বিষয়টি মেনে নিয়েছে কারণ বিয়ের সময় সে পুরোপুরি পরিবারের উপরেই নির্ভরশীল ছিলো, বিশ্বাস ছিলো তার পিতা-মাতা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না যেটা তার জন্য ক্ষতিকারক হবে। তার মতে, বিয়েটি জোরপূর্বক ছিলো না বরং আয়োজিত ছিলো, বিয়ের আগে তাদের পরিবার তাদের সাথে কথা বলেছে, এই ব্যাপারে তাদের মতামত নিয়েছে- তারা দুজনেই একই গ্রামে বেড়ে উঠেছে, ছোটবেলা হতেই পরস্পরের পরিচিত ছিলো, বয়সের এই সামান্য ব্যবধান তাদের ভাবিত করেনি, উভয় পরিবারের সদস্যবৃন্দ যখন তাদের বিয়ের ভাবনার কথা জানিয়েছে তখন আর তারা অমত করেনি, পরিবারের পরিস্থিতির কথা ভেবে তারা রাজি হয়েছে।

গবেষিত এলাকায় ছেলেদের পথে আনার একটা কৌশল হিসাবে বাল্যবিয়ে চর্চার গ্রহণযোগ্যতা দেখা গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ছেলেরা যখন লেখাপড়া ছেড়ে দেয় অথবা প্রচলিত নিয়মের বাইরে চলে যায় তখন পরিবার বিশেষতঃ অভিভাবকরা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিয়ে দেবার কথা ভাবে। ধারণা করা হয়, বউ এলে ছেলে ভালো হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষিতে গৌতমের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো-

> "গৌতম অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর আর লেখাপড়া করেনি। সে লেখাপড়া না করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় ব্যয় করত। তার বাবা তাকে দোকানে বসতে বলেন, কিন্তু গৌতম তখন দোকানে বসতে রাজি হয়নি। পরে তার বাবা-মা তাকে বিয়ে দিয়ে দেন। বর্তমানে সে তার বাবার সাথে তাদের নিজস্ব স্বর্ণের দোকানে কাজ করে। আগে সে এখানে বসতে চাইত না। কিন্তু বিয়ের পর নিয়মিত দোকানে এসে বসে। তার ভাষায়- 'লেখাপড়া করতে ভাল লাগত না,

এদিক-ওদিক ঘুরতাম তাই বাবা বিয়ে দিয়ে দিলেন। এটা আমার জন্য ভালোই হয়েছে কেননা বাড়ির কেউই এখন আর আমাকে পড়ালেখার জন্য চাপ দেয় না আর পারিবারিকভাবেই তাদের মাঝে অল্প বয়সে বিয়ে হবার রেওয়াজ আছে।"

এলাকার বয়স্ক মানুষরা মনে করে, গ্রামের দিকে ছেলেমেয়েরা শহরের তুলনায় একটু দ্রুতই বড় হয়। গোঁফ গজানোর পূর্বেই ছেলেরা বিভিন্নভাবে কাজে লেগে পড়ে- রিকশা-ভ্যান চালায়, গরু-ছাগল পালে, সবার সাথে মাঠে কাজ করে, অল্পবয়সী মেয়েরা বাচ্চাদের দেখাশোনা করে (অনেকসময় নিজেদের থেকে বছর দু'য়েকের ছোট বাচ্চাদের দেখাশোনা করে-কাঁখে করে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়), উঠান পরিস্কার করে, বাসন মাজে, রান্নার কাজে সহায়তা করে- তরকারী-পেঁয়াজ, রসুন আদা কেটে দেয়, বড়দের মতো সাজে (হাতে চুড়ি, নাক ফুল, কানে দুল পড়ে)- গ্রামে এই জিনিষগুলি প্রায়শই চোখে পরে, পরিবারের সাথে থাকা, পরিবারের জন্য কাজ করা, অল্পবয়সে বিয়ে করা- এগুলি গ্রামীন বাংলাদেশে প্রচলিত রীতি ও চর্চায় এখনও পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য নয়- তারা অনেকটাই মানসিক দিক থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন।

গবেষিত এলাকায় তরুণদের আয়োজিত বিয়ের পাশাপাশি ভালোবেসে বিয়েরও নজির দেখা গেছে, ভালোবেসে বিয়ের ক্ষেত্রে, পারিবারিক এবং সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া অথবা না পাওয়াকে-গুরুত্ব দেবার চিন্তাও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছে। অনেকেই বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের মতকে প্রাধান্য দিতে চায়, নিজের মতো করে সংসার করতে চায়- এমনকি প্রচলিত অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক না হলেও, কিছুক্ষেত্রে দেখা যায় উপার্জনক্ষম হবার পরে তারা নিজেদের মতো করে স্বাধীনভাবে থাকতে চায়- পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করে - অনেকক্ষেত্রে পরিবারের মতকেও গুরুত্ব দেয় না। এধরনের কিছু কেইস গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে যা এখানে তুলে ধরা হলো-

'হাসানের ভাষায়- আট বছর বয়স হতে সে ইট ভাটায় কাজ করে- একটা সময় তার মনে হয়েছে বাবা-মা, ভাই-বোনের পিছনে খরচ করে তার কোন লাভ নাই - এর থেকে ভালো নিজের সংসারের পিছনে খরচ করা, একটি মেয়েকে পছন্দ করে সে বিয়ে করেছে- বিয়ের সময় তার বয়স ছিলো ১৪ বছর।'

'বিয়ের কারণ সম্পর্কে আরেকজন তথ্যদাতা রাসেল মনে করেছে, এছাড়া তার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। কেননা মেয়েটির বাবা-মা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন। মেয়েটি অবশ্য তার বাবা-মাকে জানিয়ে বিয়ে করার কথা বলেছিল কিন্তু রাসেল তাতে রাজি হয়নি। এর কারণ হিসেবে সে বলে, তার মনে হয়েছিল, বাবা-মাকে জানালে তারা তাদের বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি দেবেন না বরং তারা নানাধরনের সমস্যা তৈরী করতে পারে। ফলে সে বাবা-মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে।'

এই ধরনের বিয়ের ক্ষেত্রে শারিরীক আকর্ষণের বিষয়টিও কাজ কাজ করে। বাংলাদেশে যৌনতার সামাজিক নির্মাণের ক্ষেত্রে এখনও বিয়েই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, (মুনা, ২০০৫) বিয়েই তরুণদের ক্ষেত্রে যৌনসম্পর্ক তৈরী ও বজায় রাখার একমাত্র পথ যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও বৈধ। সাধারণ সামাজিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বৈধ নয় । তবে বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক ছেলে-মেয়েদের কাছাকাছি আসার সুযোগও তৈরী করে। যেমন গড়পড়তা বিয়ের ন্যূনতম বয়সসীমা বেড়ে যাওয়া, একসাথে পড়ালেখার সুযোগ, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, বৈশ্বিক মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তরুণদের যৌনতাকে প্রভাবিত করছে, এছাড়াও তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে কাজ করেছে ছোটবেলা থেকে একই এলাকায় বেড়ে ওঠা, একই মাঠে খেলা করা, পারস্পরিক ভালো লাগা, ইত্যাকার নানাবিধ বিষয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনেক তরুণই পারিবারিক এবং সামাজিক বাধা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে। হাসানও এই

সীমারেখার মাঝে থাকতে চায়নি- গুরুত্ব দিয়েছে যে সে দৈনিকই কিছু না কিছু আয় করতে পারছে - সে স্বতন্ত্র সংসার চালাতে পারবে। বিয়ের আগে বাবা-মাকে তার পছন্দের কথা কখনোই জানায়নি, কেননা সে নিশ্চিত ছিলো তারা কখনোই এই বিয়েকে মেনে নেবে না, যদি মেনে নাই নেয় তবে সে তার স্ত্রীর ভরনপোষণ করতে পারবে। হাসানের বিয়ে করার ক্ষেত্রে পারিবারিক এবং সামাজিক বাধা ভেঙ্গে ফেলা, নিজের মতো করে সংসার করা বিশেষতঃ বড়দের মতো হয়ে উঠার চেষ্টা করার মতো কিছু বিষয় কাজ করেছে।[৮] রাসেল ভেবেছে গোপনে বিয়ে করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই কেননা তাদের সম্পর্কের কথা জানার পরই তার স্ত্রীর পরিবার মেয়েটিকে দ্রুত বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। বিয়ের পর বকাঝকা করলেও প্রথমে রাসেলের পরিবার ও পরে মেয়েটির পরিবার তাদের সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে।

পারিবারিক পর্যায়ে অভিভাবকদের মাঝে নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতার আতঙ্ক দেখা যায়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ককে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হয় না, অধিকাংশ অভিভাবকই সাধারণত এ ধরনের সম্পর্ককে অনুমোদন করেননা। ছেলেদের ক্ষেত্রে তেমন কোন কঠিন সিদ্ধান্ত না নিলেও মেয়েদের এ ধরনের কোনো সম্পর্কের কথা জানলে অভিভাবকরা দ্রুত তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। মেয়েদের পবিত্রতা রক্ষার বিষয় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের শুদ্ধতার গুরুত্ব দেবার বিষয়টি অনেক নৃবিজ্ঞানীর কাজেই এসেছে। ওর্টনার (১৯৭৮) দেখিয়েছেন পৃথিবীব্যাপী নানা সমাজে মেয়েদের শুদ্ধতার বিষয়টির সাথে পরিবারের সম্মান ও সামাজিক অবস্থান যুক্ত যার কারণে পরিবার মেয়েদের সামাজিক আচরণ ও যৌনতাকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রন করে। ক্যান্ডিয়োটি (১৯৮৮) এই 'সম্মান ব্যবস্থাকে' পিতৃতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখিয়েছেন। রোজারিও (১৯৯২: ১৪০) এই প্রেক্ষিতে বলেছিলেন 'বাংলাদেশের সমাজে মেয়েদের পবিত্রতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, কেউ যেন এই বিষয়ে সন্দেহ না করে তার জন্য তরুণ বয়সেই অনেক মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়ে থাকে- বিয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ বয়স সাধারণত ১৫-১৬ বছর'। গবেষিত এলাকায় দেখা গেছে মেয়ের বাবা-মাও সাধারণত কোন সমবয়সী ছেলের হাতে তার মেয়েকে তুলে দেয়ার জন্য সম্মত থাকেন না, একইভাবে ছেলের বাবা-মাও সম্মত থাকেন না। এ কারণে পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে গোপনে নিজে বিয়ে করাকেই ছেলেমেয়েরা সহজতর পথ হিসাবে বেছে নেয়। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তরুণদের এ ধরনের বিয়ে অভিভাবকদের অমতেই সংগঠিত হয়।

বালক বিয়ের পেছনে সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক প্রচলন গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করে বলে অনেক তথ্যদাতা মনে করেন। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের গড় বিয়ের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী ছেলেমেয়েকে দ্রুত বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয় বলে স্থানীয়রা মনে করে। ইসলাম ধর্ম মতে মনে করা হয়, ছেলেমেয়ে সাবালক হলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত। তবে সাবালক বলতে নির্দিষ্ট করে কোন বয়সকে বোঝানো হয় না। সমাজের প্রচলিত ধারণানুযায়ী ছেলেমেয়েরা যখন নিজের সম্পর্কে বুঝতে শেখে তখনই তাদের বিয়ে দেয়া উচিত বলে মনে করা হয়। গবেষণা এলাকার মসজিদের ইমাম হারুন মুন্সির বক্তব্য অনুযায়ী মুসলমান ধর্ম মতে 'বালেগ' হবার পরই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। যদি তা না দেয়া হয় আর কোন কারণে ছেলেটি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায় তবে সে যত ভালো কাজই করুক বেহেশতে যেতে পারবে না। তাই অল্প বয়সে ছেলেদের বিয়ে করা ভাল। সমাজে কেউ কেউ দাবী করে দেরীতে বিয়ে ছেলেদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এর কারণে পুরুষত্বহীনতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

[৮] ড. ফারজানা ইসলাম তার পিএইচডি কাজের সময় দেখেছেন গ্রামে নয়, শহরেও বালক বিয়ের চর্চা আছে - ইসলামপুর বস্তিতে পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে অনেক ছেলেমেয়েদেরই বিয়ে হতে দেখেছেন তিনি। তবে তার মতে এই বিয়েগুলি সাধারণত বেশি দিন টেকেনা - অল্প বয়সেই যখন তাদের সন্তানের দায়িত্ব নিতে হয় - তখন তারা আর এই ভার বহন করতে চায় না, সাধারণত মেয়েরাই সন্তানের দেখাশোনা করে।

স্বতন্ত্র সমাজের মাঝে ব্যক্তিরা নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে বালিকা বিয়ের মতোই বালক বিয়ের চর্চা করে। স্যুলার ও রোটাচের কাজে দেখা গেছে (স্যুলার ও রোটাচ, ২০১১)। বাল্য বিয়ে চর্চার পেছনে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের তুলনায় নানা ধরনের প্রেক্ষিতনির্ভর অবস্থার নজির বেশি। এই গবেষণাতেও দেখা গেছে প্রত্যেকটি বালকবিয়ের পেছনে সুনির্দিষ্ট পারিবারিক-সামাজিক-সংস্কৃতিক প্রেক্ষিত কাজ করছে যা বোঝা প্রয়োজন নতুবা এটাকে কেবল পশ্চিমা হেজেমনির অংশ হিসাবে দেখা হবে। বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে বিরোধী আইন আছে- যেখানে ছেলে-মেয়ে উভয়ের বিয়ের ন্যূনতম বয়সই সুস্পষ্ট করা আছে, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় থেকে এই চর্চা হতে নাগরিককে নিরুৎসাহিত করার জন্য গত তিনদশক ধরে বাংলাদেশে নানা কর্মসূচী গ্রহন করতে দেখা গেছে- তারপরও বাল্যবিয়ে আছে (স্যুলার ও রোটাচ, ২০১১)। । আইন নয় ব্যক্তিই এই চর্চাকে টিকিয়ে রাখছে, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনেই প্রেক্ষিত নির্ভর নানধরনের সামাজিক অনুষঙ্গ কাজ করছে। তারা স্বজ্ঞানেই এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং এটি তাদের অবস্থান থেকে বোঝা গুরুত্বপূর্ন।

### উপসংহার:

সাধারণত বাল্যবিয়েকে কিছু বিষয়ের সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়- মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা, অর্থনীতি ও মানবসম্পদের জন্য ক্ষতিকর সর্বোপরি উন্নয়নের পথে বাধা। এটাকে 'পিতৃতন্ত্রের খারাপ চর্চা' হিসাবে বিবেচনা করা হয়- মনে করা হয় উপমহাদেশে বাল্যবিয়ের শিকার হয় কেবলমাত্র নিষ্পাপ নারী শিশুরা, যাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাল্যবিয়ের অভিজ্ঞতাকে জবরদস্তিমূলক হিসাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে দায়ী করা হচ্ছে তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে, যদিও বাস্তবে এমনও পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে বাবা-মা মেয়ের ভরনপোষণের কথা চিন্তা করে আগেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বাংলাদেশেও এই ধরনের অধিকার কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বাল্য বিয়েকে দেখা হয়েছে এবং এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকেছে কি কারণে এখনও বাল্যবিয়ে হচ্ছে তাকে ঘিরে যে স্থানীয় বিস্তৃত বাস্তব প্রেক্ষিত রয়েছে। বালকবিয়ের চর্চাকে দেখাতে গিয়ে এখানে কিছু মানুষের জীবনের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে যা অনেকক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত আধিপত্যশীল বয়ানের বিপরীতে দাঁড়ায়। যদিও এটা স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য এই গবেষণায় পর্যাপ্ত এথনোগ্রাফিক উপাত্তের অভাব আছে তবুও এই গবেষণা ইঙ্গিত করে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবর্জিত কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বাল্যবিয়েকে বোঝা সম্ভব না। পশ্চিমা সমাজচিন্তাতেও বিয়ে ও এর অর্থময়তা সর্বদা একরকম ছিলো না, উত্তর-উপনিবেশিত সময়ে এটাতে নানাবিধ বদল এসেছে- বিয়ে কেবলমাত্র পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তিক ইচ্ছা ও ভালোবাসার বিষয় না এটাতে বাইরের বিষয় এরও প্রভাব আছে, এটা অনেকাংশে বেঁচে থাকা- টিকে থাকা, সামাজিক পরিচিতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ সর্বোপরি স্থানিক সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নির্ভর একটি বিষয়। বালক বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা দু'টি বড় বর্গ দেখেছি। স্বাভাবিক বিয়ের মতোই কোন ক্ষেত্রে বিয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা মূখ্য, আবার কোনক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নিজেদের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়েছে- তবে প্রত্যেকটা কেসের ক্ষেত্রেই প্রেক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন।

### তথ্যসূত্র

Anitha, S. and Gill, A. (2009) Coercion, Consent and the forced marriage debate in the *UK Feminist legal studies* 17: pp. 165-184

Blanchet, T. (1996) *Lost Innocence. Stolen Childhoods.* Dhaka: University Press Ltd.

Chantler, K. (2012) Recognition of and Intervention in Forced Marriage as a Form of Violence and Abuse. *Trauma, Violence, & Abuse*, 13(3): pp. 176-183.

Convention on elimination of all forms of discrimination against women (1979), *UN General Assembly resolution34/180* [Online] Available from: http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ cedaw.pdf [Accessed 01.04. 2017]

Escobar, A. (1995) *Encountering Development: The making and Unmaking of the Third World.* Princeton University Press 2012

Goody, J. ed(1971). *Kinship* London: Penguin

Gupta, A. and Ferguson J. (1997). Discipline and Practise: The field as Site, Method and Location in Anthropology. inGupta, A. and Ferguson J (eds) *Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science*, London: University of California press

Islam, F.(2001). *Women, Employment and the family: Poor Informal Sector Women Workers of Dhaka City.* Unpublished DPhil Thesis, University of Sussex.

Islam, M (2005). *Child Wives in Bangladesh.* Dhaka: Dhaka University Press.

Lughod, L A (2002). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural

Relativism and Its Others. *American Anthropologist 104(3)*: pp. 783-790.

Mankekar, P. (1997). 'To Whom Does Ameena Belong? Towards a Feminist Analysis of Childhood and Nationhood in Contemporary India.'*Feminist Review,* 56: pp. 26-60.

Miller, A M. and Vance C S. (2004) *Sexuality. Human rights and Health* [Online] Available from: https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/13/2013/07/3 -Miller.pdf [Accessed 02.04. 2017]

Muna, L. (2005) *Romance and Pleasure*: Understanding the Sexual Conduct of Young People in Dhaka in the Era of HIV/AIDS (Abstract). Dhaka: University Press Limited (UPL)

Ortner, S B. and Hariett W. eds (1981). *Sexual Meaning: The cultural construction of Gender and Sexuality.* Cambridge: Cambridge University press

Rozario, S. (1992). Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village. *Women in Asia Publication Series.* Zed Books Ltd.

Schuler, S.R., Bates, L.M., Nanda, G, Islam, F., and Islam M.K. (2005). "*Early marriage and childbearing in rural Bangladesh.*" [Online] Available from: http://www.bwhc.org [Accessed 02.04. 2017]

Schuler, S R. and Elisabeth R. (2011). Why Does Women's Empowerment in One Generation not Lead to Later Marriage and Childbearing in the Next?: Qualitative Findings from Bangladesh. *Journal of Comparative Family Studies* 42(2):pp. 253-66

Siddiqui, D. (2010). `Blurred Boundaries: Sexuality and Seduction Narratives in Selected "Forced Marriage" Cases from Bangladesh'. In Ho*nour' and Women's Rights: South Asian Viewpoints* Edited by Manisha Gupte, Ramesh Awasthi And Shraddha Chickerur. Pune: Masum

Spivak G. C. (1993), 'Can the Subaltern Speak?', in *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*, (eds.) Patrick Williams and Laura Chrisman. Hemel Hempstead: Harvester, pp. 90-105

UN Centre for Human Rights (1995), Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, *Fact Sheet no. 23.*

UNFPA (2013) *Addressing Gender Based Violence* [Online] Available from: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2013/final%20sexual%20violence%20CSW%20piece.pdf [Accessed 02.04. 2017]

United Nations International Children's Emergency Fund (2001). *Early Marriage child Spouses.* Florance: Innocenti Research center

United Nations International Children's Emergency Fund (1998). *Handbook for the Convention on the Rights of the Child.* New York: Geneva.

United Nations International Children's Emergency Fund (1994). *Too Old for Toys, Too Young for motherhood.* New York.

United Nations International Children's Emergency Fund (2014) *Child protection from violence, exploitation and abuse* [Online] Available from:http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html [Accessed 02.04. 2017]

United Nations (1946). *Universal Declaration of Human Rights*, [Online] Available from: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf [Accessed 02.04. 2017]

White, S C. (1992). *Arguing with the crocodile. Gender and class in Bangladesh.* Dhaka: University press limited.